শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম

স্বামী সর্বাত্মানন্দ

সমগ্র ভারতবর্ষে, বিশেষত দক্ষিণভারতের রামানুজী সম্প্রদায় বা শ্রীসম্প্রদায়ের ভক্তদের কাছে প্রাতঃস্মরণীয় শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম পারায়ণ এক নিত্যকর্ম। হরিদ্বার, দেবপ্রয়াগাদি তীর্থে এটি একটি অত্যন্ত পরিচিত দৃশ্য যে বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণাদি তীর্থযাত্রী গঙ্গাস্নান করে ওই ঘাটে বসে বসেই বিষ্ণুসহস্রনাম পাঠ করছেন। উত্তরাখণ্ডে বদরিনাথ ধামে প্রভাতে শ্রীমন্দিরের দ্বার খোলা হয় শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম মন্ত্র দ্বারা। বেদপাঠী ব্রাহ্মণেরা গর্ভগৃহের দ্বারের দুপাশে বসে বিষ্ণুসহস্রনাম পাঠ করতে থাকেন। অন্দরে পূজারি 'রাওয়ালজী' শ্রীমূর্তির স্নানাভিষেক করতে থাকেন। এরপর সহস্রনামাবলী পাঠ হতে থাকে, প্রত্যেকটি নামের উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে তুলসীগুচ্ছ অর্পণ হতে থাকে নারায়ণের শ্রীচরণে। সন্ধ্যা হতেই দীর্ঘকাল ধরে হতে থাকে বারংবার শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম। স্বর্ণ-রজত আধারে কর্পূরারতি, দীপারতি সহ বিষ্ণুসহস্রনাম পাঠ হতে থাকে। ভক্তেরা নিজ নিজ নামগোত্রে সংকল্প করে এই পাঠ নারায়ণে অর্পণ করেন। সমস্তদিন বদরি শ্রীমন্দিরে ধ্বনিত হতে থাকে তাঁর সহস্রনাম। প্রায় একই ঘটনা অনুবর্তিত হয় পূর্বপ্রান্তের 'ধাম' শ্রীজগন্নাথপুরীতে, পশ্চিমপ্রান্তে শ্রীদ্বারকায়। নিত্য 'চারধাম' ধ্বনিত হয় নামের স্পন্দনে। বহু সাধকের কাছে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার সঙ্গে শ্রীবিষ্ণুসহস্রনামও এক নিত্যপাঠ্য স্বাধ্যায়।

মহাভারতের শান্তিপর্বে এই সহস্রনামটি উচ্চারিত হয়েছে কুরুপিতামহ শ্রীভীষ্মদেবের শ্রীকণ্ঠে। ইচ্ছামৃত্যুবরপ্রাপ্ত ভীষ্ম কুরুক্ষেত্রপ্রাঙ্গণে শরশয্যায় শায়িত শুভক্ষণ উত্তরায়ণের প্রতীক্ষায়. সেই সময়ে তিনি এই নারায়ণস্তুতিটি করেছেন প্রত্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণসান্নিধ্যে, পৌত্র ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বিভিন্ন প্রসঙ্গে উপদেশদানের অনুষঙ্গে।

মহাভারতের শান্তিপর্বের চল্লিশতম অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক বর্ণিত হয়েছে। অভিষেকের পরদিন প্রভাতে পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত অন্তর্মুখ, ধ্যানাসনে স্থির হয়ে বসে আছেন। প্রাতঃপ্রণামে যুধিষ্ঠির সহ পাণ্ডবেরা এসেছেন কিন্তু গভীর ধ্যানে নিশ্চল মৌনমূর্তি শ্রীভগবান। ধ্যানশেষে তিনি ব্যুত্থিত হলে যুধিষ্ঠির বলছেন, "কী আশ্চর্য, মাধব, তুমি ধ্যান করছ? ত্রিলোকের সকল মঙ্গল তো? যদি একান্ত গোপনীয় না হয়, যদি আমাদের শোনার যোগ্যতা থাকে, তবে আমাদের বলো তোমার 'ধ্যেয়' কে, কী তোমার ধ্যানের বিষয়?"

উপস্থিত সকলকে বিস্মিত করে ভগবান বললেন, "পরমবৈষ্ণব, পরম ভক্ত, জ্ঞানবৃদ্ধ কুরুপিতামহ, গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম আমাকে স্মরণ করছেন, উত্তরায়ণ সমাগত, তাঁর মহাপ্রয়াণ সমুপস্থিত।" যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ প্রত্যক্ষ করলেন, "অবতারপুরুষের নরদেহে বিচ্ছুরিত হল দিব্য আলোর ছটা, অপার্থিব উজ্জ্বলতার ঝলক।" পরক্ষণেই লৌকিক সাধারণ স্তরে নেমে এসে ভগবান বললেন, "যুধিষ্ঠির, পিতামহের অন্তিম ক্ষণ সমুপস্থিত, এইসময় আমাদের সেখানে উপস্থিতির নৈতিক প্রয়োজন।"

এরপর দেখতে পাই ওঘবতী নদীর তীরে ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে ভীষ্মের শরশয্যার পাশে শ্রীকৃষ্ণ ও পঞ্চপাণ্ডবকে। বহু দেবর্ষি, রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি পরিবৃত হয়ে বিদ্ধশর, রক্তাক্ত ভীষ্মদেব শুয়ে আছেন, শ্রীকৃষ্ণে নিবদ্ধদৃষ্টি তিনি। তদ্‌গতচিত্ত তাঁর নয়নে অশ্রু।

শ্রীমদ্‌ভাগবতেও এই দৃশ্যের বর্ণনা করেছেন শুকদেব। তিনি বলছেন, ধর্মভয়ে যুধিষ্ঠির ভীষ্মসকাশে গেছেন 'সর্বধর্মবিবিৎসয়া'—'সর্বেষাং ধর্মানাং বেদিতুম্ ইচ্ছয়া'—সমস্ত ধর্ম জানার ইচ্ছা নিয়ে। তাঁদের দেখে ভীষ্ম বললেন,

"যত্র ধর্মসুতো রাজা গদাপাণির্বৃকোদরঃ।
কৃষ্ণোঽস্ত্রী গাণ্ডিবং চাপং সুহৃৎ কৃষ্ণস্ততো বিপৎ॥
ন হ্যস্য কর্হিচিদ্‌রাজন্ পুমান্ বেদ বিধিৎসিতম্।
যদ্বিজিজ্ঞাসয়া যুক্তা মুহ্যন্তি কবয়োঽপি হি॥"

(১।৯।১৫-১৬)

—যেখানে ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির, গদাপাণি ভীম, ধনুর্ধর অর্জুন, যেখানে সুহৃদ্‌বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং, সেখানে এত বিপদ-দুর্দশা! হে রাজন্, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে কী ইচ্ছে, তা কেউই জানতে পারে না, জ্ঞানীরাও নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণও এই প্রসঙ্গটি করতেন। কথামৃতে পাই, "...ভীষ্মদেব দেহত্যাগ করবেন, শরশয্যায় শুয়ে আছেন, পাণ্ডবেরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সব দাঁড়িয়ে। তাঁরা দেখলেন যে, ভীষ্মদেবের চক্ষু দিয়ে জল পড়ছে। অর্জুন বললেন, 'ভাই, কি আশ্চর্য! পিতামহ, যিনি স্বয়ং ভীষ্মদেব, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, জ্ঞানী, অষ্টবসুর এক বসু, তিনিও দেহত্যাগের সময় মায়াতে কাঁদছেন!' শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মদেবকে এ-কথা বলাতে তিনি বললেন, 'কৃষ্ণ, তুমি বেশ জানো, আমি সেজন্য কাঁদছি না! যখন ভাবছি যে, যে পাণ্ডবদের স্বয়ং ভগবান নিজে সারথি, তাদেরও দুঃখ-বিপদের শেষ নাই, তখন এই মনে করে কাঁদছি যে, ভগবানের কার্য কিছুই বুঝতে পারলাম না।' "

এই অবকাশে ভক্ত-ভগবানের একটি রহস্যময় ব্যবহার ভীষ্ম ও শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। ভক্তের অন্তিমক্ষণে অন্তর্যামী ভগবান নিজে এসেছেন ভক্তসমীপে। ভীষ্মের অন্তর আনন্দে আবেগে পূর্ণ অথচ তার কোনও বহিঃপ্রকাশ নেই। সাংসারিক সম্পর্ককে মান্যতা দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে প্রণাম করলেন। ভীষ্ম মানসে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে মুখে বললেন, "আনন্দে ভক্তিসহায়ে তদ্‌গতচিত্ত যোগী যাঁর নামকীর্তনপূর্বক দেহত্যাগ করে সমস্ত সংসারপ্রদ কর্ম থেকে মুক্ত হন, সেই ধ্যানের বস্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, প্রসন্ন হাস্য এবং অরুণনয়নে শোভিত যাঁর মুখপদ্ম, যিনি দেবাদিদেব, চতুর্ভুজ, যে পর্যন্ত না আমি দেহ পরিত্যাগ করি আমার নিকট অবস্থান করুন..."

জ্ঞাতিবধের জন্য সন্তপ্ত যুধিষ্ঠিরের শোক দূর করতে ভীষ্ম যাতে তাঁকে ধর্মোপদেশ দেন, সেজন্য শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মকে অনুরোধ করলেন। কৃতাঞ্জলি ভীষ্ম বললেন, "দুর্বলতার ফলে আমি বাক্‌শক্তিহীন হয়েছি। দিক আকাশ পৃথিবীর বোধ লোপ পেয়েছে... কৃষ্ণ তুমি শাশ্বত জগৎকর্তা, গুরু উপস্থিত থাকতে শিষ্যতুল্য আমি কী করে উপদেশ দেব?"

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "গঙ্গানন্দন ভীষ্ম, আমার বরে আপনার গ্লানি, কষ্ট, ক্ষুৎপিপাসা থাকবে না। সমস্ত জ্ঞান আপনার নিকট প্রকাশিত হবে।"

পরদিন থেকে প্রশ্নোত্তর শুরু হল—রাজধর্ম, বর্ণাশ্রমধর্ম, করনিয়োগ, দণ্ডবিধি, রাজচর্যা, যুদ্ধনীতি —একে একে সমস্ত রাজতন্ত্রের তত্ত্বোপদেশ হতে লাগল, দিনের পর দিন! যুধিষ্ঠির অক্লান্ত তাঁর প্রশ্নে, অবোধিক স্বতঃস্ফূর্ত পিতামহ ভীষ্ম তাঁর উত্তরে—তত্ত্বসূত্রে উপস্থাপনার অভিনবত্বে অসামান্য আমাদের এই মহাকাব্য সম্পদ, মহাভারতের শান্তিপর্ব।

প্রশ্নে প্রশ্নে অবধারিতভাবে এল শ্রেয়ঃপ্রসঙ্গ। ভীষ্ম বললেন, "লোকের যে বিষয়ে নিষ্ঠা হয় তাকেই শ্রেয়োজ্ঞান করে। অন্য বিষয়ে তার প্রবৃত্তি হয় না। তবে বৈরাগ্যের উদয় হলে আত্মমোক্ষের জন্য যত্ন নেওয়া উচিত।" এ যেন ভীষ্মের মুখে আক্ষরিকভাবে উপনিষদের মন্ত্র : "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ।" এই অনুষঙ্গে তিনি সনৎকুমার কথিত বিষ্ণুমাহাত্ম্যটি যুধিষ্ঠিরকে বর্ণনা করেন।

অর্থাৎ বিষ্ণুসহস্রনামের আচার্যপরম্পরা খুঁজতে হলে ভীষ্ম-সনৎকুমার এই সূত্রে ভাবতে হবে। ভারতীয় দর্শনে সকল মন্ত্রই সাধকের হৃদয়ে উদ্ভাসিত। ঈশ্বরভাবনাগুলির দ্রষ্টা হিসেবে তাঁরা নিজেদেরকে ভেবেছেন, 'ঋষির্নাম দ্রষ্টারঃ', কখনই

স্রষ্টার অহমিকা প্রকাশ করেননি। সমস্ত মন্ত্রের স্রষ্টার অভিমানী দেবাদিদেব মহাদেব, মহেশ্বর। সমস্ত মন্ত্রের শ্রোতা আদ্যাশক্তি মহামায়া, মাহেশ্বরী। পুরাণেও তাই সর্বত্র দেখা যায় শিব-পার্বতীর আখ্যানে বিবৃত সমস্ত শাস্ত্র, সমস্ত মন্ত্র।

এখানে একটা প্রশ্ন খুব স্বাভাবিকভাবেই মনে ওঠে. অদ্বৈতবেদান্তের প্রচারের পূর্বে আচার্য শংকর তাঁর 'প্রস্থানত্রয়' ভাষ্যরচনার প্রারম্ভে বিষ্ণুসহস্রনাম-এর ভাষ্য রচনায় উদ্যোগী হলেন কীভাবে? যদিও তাঁর ভাষ্য অদ্বৈতভাবে রচিত, তবুও তত্ত্বত অদ্বৈত হলেও নাম-সাধনা মূলত দ্বৈতভাবকেই পুষ্ট করে। প্রসঙ্গে দুটি কাহিনি শোনা যায়—

বদরিনাথে বসে আচার্য উপনিষদভাষ্য রচনার পূর্বে আদ্যাশক্তিকে স্মরণ করার ইচ্ছায় তাঁর শিষ্যের কাছে ললিতাসহস্রনাম চেয়ে পাঠান। শিষ্য ভুল করে বিষ্ণুসহস্রনাম নিয়ে আসেন। আচার্য শিষ্যের ভুল সংশোধন করে পুনরায় ললিতাসহস্রনাম আনতে বলেন। শিষ্য পুনঃ ভ্রমিত হয়ে বিষ্ণুসহস্রনাম নিয়ে আসেন। একাধিকবার এই ভ্রম হতে থাকলে আচার্য বিস্মিত হন। সেইসময় তিনি দৈবাদিষ্ট হন এই গ্রন্থের ভাষ্য রচনার জন্য।

দ্বিতীয় কাহিনিটি হল, বদরিনাথে আচার্য উপনিষদের ভাষ্যরচনা আরম্ভ করেছেন। প্রথম কয়েক পৃষ্ঠা লিখে দ্বিতীয়দিন উপনিষদে হাত দিলে, প্রথম পৃষ্ঠাগুলি দেখলেন অন্তর্হিত। ভাষ্যকার এটি নিজের ভুল ভেবে পুনরায় লিখলেন। পরের দিন পুনরায় দেখলেন পৃষ্ঠাগুলি অন্তর্হিত। বদরিনাথজীর এ এক রঙ্গ-রসিকতা মনে করে তিনি 'মঙ্গলাচরণ'-এর ভাবে পাঠ করার ভাবনা নিয়ে বিষ্ণুসহস্রনাম পাঠ করেন। পাঠকালে তাঁর ভাষ্য লেখার ইচ্ছে হয় এবং তিনি কিছুটা ভাষ্য রচনা করেন। কিন্তু আশ্চর্য সেবার তাঁর কোনও পৃষ্ঠা অন্তর্হিত হয় না। ভাষ্যকার বিস্মিত হয়ে 'দৈব ইচ্ছা'-র অনুগামী হন। বিষ্ণুসহস্রনাম ভাষ্যরচনা সমাপ্ত করেই তিনি উপনিষদে হাত দেন।

কোনও কোনও পণ্ডিত এমনও মনে করেন যে, সমাবর্তনের সময় আচার্য গৌড়পাদের আদেশে তাঁর চরণপ্রান্তে বসেই আচার্য শংকর লিখেছিলেন বিষ্ণুসহস্রনামের ভাষ্য এবং গৌড়পাদের আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন।

ঘটনা যাই হোক, শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম আচার্য শংকরের শুধু প্রথম ভাষ্যরচনাই নয়, এটি আচার্যের জীবনে দৈবাদিষ্ট মাঙ্গলিক কার্য। নারায়ণের আশীর্বাদ নিয়ে তিনি শুরু করেছিলেন তাঁর দিগ্বিজয়ী যাত্রা।

ভাষ্যরচনার পূর্বে তিনটি মঙ্গলাচরণ করেছেন ভাষ্যকার। রচনার প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ এক শিষ্টাচার যা এক শাস্ত্রীয় পরম্পরা। এখানে তিনটি মঙ্গলাচরণের প্রথম দুটি নমস্কারাত্মক মঙ্গলাচরণ—এর মধ্যে প্রথমটি শ্রীকৃষ্ণস্তুতি, গোপালপূর্বতাপনীয়োপনিষদ থেকে নেওয়া, দ্বিতীয়টি ব্যাসস্তুতি। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে এবং গ্রন্থরচয়িতা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকে প্রথম দুটি মঙ্গলাচরণের মাধ্যমে প্রণাম জানানো হয়েছে। তৃতীয়টি তত্ত্ববোধাত্মক এবং গ্রন্থপাঠের প্রয়োজনাত্মক মঙ্গলাচরণ, যে মঙ্গলাচরণের মাধ্যমে অনুবন্ধ চতুষ্টয় বলেছেন ভাষ্যকার—গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় বস্তুটি কী, ওই বিষয়ের অধ্যয়ন বা চর্চার প্রয়োজন কী এবং ওই চর্চার অধিকারী কে হতে পারে।

"সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে।

নমো বেদান্তবেদ্যায় গুরবে বুদ্ধিসাক্ষিণে।।"[১]

সমস্ত উপনিষদকে যিনি অনায়াসে দোহন করে উপভোগ্যেহ অর্জুনকে বেদান্তামৃত সেবন করিয়েছেন, সেই সচ্চিদানন্দরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম। বেদান্তের জ্ঞেয়বস্তু যিনি, বেদান্ত যাঁকে ব্যাখ্যা করেছেন সেই শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম। গুরুস্তোত্রে (বিশ্বসারতন্ত্র) গুরুকে সকল বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষিস্বরূপ বলা হয়েছে—"একং নিত্যং বিমলম্ অচলং সর্বধীসাক্ষীভূতম্।" সেই গুরু শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম।

"কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং সর্বলোকহিতে রতম্।

বেদাব্জভাস্করং বন্দে শমাদিনিলয়ং মুনিম্ ।।"[২]

বিবেকচূড়ামণিতে আচার্য শংকর এই প্রাজ্ঞজনদের বসন্তের সঙ্গে তুলনা করেছেন—"বসন্তবৎ লোকহিতং চরন্তঃ।" গীতাতেও ওই বিরলগুণের মানুষদের ঈশ্বরসমীপে বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে—"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ।" কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস সেই ঈশ্বরকোটি পুরুষ—বেদ যাঁর করস্পর্শে বাঙ্ময় হয়ে

ওঠে। বেদ যদি পদ্মপুষ্প হয়, ব্যাসদেব তবে দিবাকর সূর্য। বেদরূপী পদ্ম ব্যাসরূপী সূর্যালোকে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। শমদমাদি সাধনের অধিষ্ঠানরূপ আদর্শরূপ সেই আচার্যকে প্রণাম।

তৃতীয় মঙ্গলাচরণটির লাক্ষণিক পুরুষ হচ্ছেন সেই 'পুরুষোত্তম'। "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।" পুরুষসূক্তের আদলে মঙ্গলাচরণ করছেন ভাষ্যকার :

"সহস্রমূর্তেঃ পুরুষোত্তমস্য সহস্রনেত্রানন-পাদবাহোঃ।
সহস্রনাম্নাং স্তবনং প্রশস্তং নিরুচ্যতে জন্মজরাদিশান্ত্যৈঃ॥"

'বিষ্ণু'—ব্যাপ্তৌ ধাতু হতে বিষ্ণু শব্দের ব্যুৎপত্তি—সর্বব্যাপী সেই পুরুষ ব্রহ্মাণ্ডকে সর্বতোভাবে পরিবেষ্টন করে আছেন—"সঃ ভূমিং বিশ্বতঃ বৃত্বা।" সর্বপ্রাণীর সমষ্টিরূপ এই পুরুষকে বেদ বলছেন 'বিরাট'-এর জনক—"তস্মাৎ বিরাট্ (ব্রহ্মাণ্ড শরীর) অজায়ত।" হাজার হাজার তাঁর মস্তক, হাজার হাজার তাঁর নেত্র, হাজার হাজার তাঁর আনন, হাজার হাজার তাঁর হস্ত-পদ। এখানে 'হাজার হাজার' অনন্ত শব্দের বাচক।

রুদ্রস্তুতিতে (শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ) বলা হয়েছে, "সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।/ সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।"—ওই পুরুষের সর্বত্র হস্ত এবং পদ, সর্বত্র অক্ষি, শিরঃ, মুখ। সর্বত্র কর্ণ (শ্রুতিমৎ)। লোকে অর্থাৎ সংসারে, সর্বম্—সমস্ত বস্তুমাত্রকে, আবৃত বা ব্যাপ্ত করে তিনি আছেন—তিষ্ঠতি। ভাষ্যকার বলছেন, 'হাজার-নাম' দ্বারাই এঁর স্তুতিকর্ম বিধেয়—সহস্রনাম্নাং স্তবনং প্রশস্তম্। এই স্তুতির বা পাঠের পরিণাম বা ফল—'জন্মজরাদির শান্তি।'

এখানে যেন আরও গভীর ইঙ্গিত দিচ্ছেন ভাষ্যকার। 'সহস্র' শব্দ যেমন বিরাট পুরুষের সঙ্গে আক্ষরিক অর্থে নেওয়া ভুল, অনন্ত অর্থে নিতে হয়। তেমনই ওই পুরুষের 'সহস্র নাম'-ও আক্ষরিক অর্থে সহস্রবাচক নয়, অনন্তবাচক অর্থে নিতে হবে। সংখ্যাতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রীবিষ্ণুকে একহাজার নামের সীমায় সীমাবদ্ধ করা ভয়ংকর ভ্রান্তিস্বরূপ। কারণ হরি অনন্ত, হরিকথা অনন্ত। *ক্রমশ*